নেহরুর উন্নয়ন ভাবনা এবং বাংলাদেশের ‘মেগা’ উন্নয়নের ঘোর

মাহা মির্জা

"Over the last fifty years India has spent Rs. 80,000 crores on the irrigation sector alone. Yet there are more drought-prone areas and more flood-prone areas today than there were in 1947"

গান্ধীয়ান অর্থনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রে ছিল বাসাবাড়িভিত্তিক উৎপাদন (হাউসহোল্ড প্রোডাকশন)। গ্রামীণ কারিগর, শ্রমনির্ভর মেশিন আর স্বনির্ভর স্থানীয় অর্থনীতি। কিন্তু নেহরুর ‘ফ্যাসিনেশন’ ছিল ভারী শিল্পে, মেগা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রকল্পে। ওই সময় ভারতের উন্নয়ন চিন্তার কেন্দ্রেই ছিল হেভি ইন্ডাস্ট্রি বা ভারী শিল্প। চল্লিশের দশকে আম্বেদকার থেকে শুরু করে সুভাষচন্দ্র বসু বা হিন্দুসভার প্রতিষ্ঠাতা ভি ডি সাভারকার–সকলেই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে দ্রুত শিল্পায়ন এবং ভারী যন্ত্রায়ণের পক্ষে ছিলেন। ভারতে স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম পাঁচ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বড় বাঁধ, স্টিল কারখানা, আর হাইড্রো বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। স্বাধীনতার পরপরই হিরাকুদ বাঁধ, বাখরা বাঁধ আর নাগার্জুনাসাগর বাঁধের নির্মাণকাজ শুরু হয়। বিপুল বাজেটে নির্মিত এই বাঁধগুলোতে একাধারে সেচ ক্যানেল পরিচালনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ আর হাইড্রো বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল।

পঞ্চাশের দশকে বড় বাঁধ, বৃহৎ শিল্প আর মেগা সেচ প্রকল্পের একনিষ্ঠ প্রবর্তক ছিলেন নেহরু। নেহরুর প্রথম দশকে বাঁধকে বলা হত ‘টেম্পল অব মডার্ন ইন্ডিয়া’ বা আধুনিক ভারতের মন্দির। ১৯৫৪ সালে বাখরা নাঙ্গাল বাঁধ খুলে দেয়ার দিন নেহরু বলেছিলেন : "Which place can be greater than Bakhra Nangal where thousands of men have worked or shed their blood and sweat, and laid down their lives as well? where can be a holier place than this...?" ১৯৫৫ সালে ‘নাগার্জুনাসাগর’ বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তরে নেহরুকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এভাবে : "This is the foundation of the temple of humanity in India"। ১৯৪৮ সালে হিরাকুদ বাঁধের কারণে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া গ্রামবাসীর কাছে নেহরু বলেছিলেন, "ত্যাগ যদি করতেই হয়, সেটা দেশের স্বার্থের জন্য করাই ভাল" (If you are to suffer, you should suffer in the interest of the country)। ভারতীয় ইতিহাসবিদ সুনীল খিলনানি ১৯৫০ সালে নেহরুর প্রথম দশককে বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর ক্লাসিক প্রবন্ধ ‘Idea of India’-তে লিখেছিলেন, "India fell in love with the idea of concrete"।

> নেহরু বাঁধকে ‘ভারতের মন্দির’ বলেছিলেন, সেই ইতিহাস বহুল প্রচলিত, কিন্তু নেহরু যে ‘ভারতের বাঁধ-ভারতের মন্দির’ এই অর্থনৈতিক দর্শন থেকে সরে এসেছিলেন, এবং ক্ষুদ্র ও গ্রামভিত্তিক অর্থনৈতিক চিন্তায় মনোযোগী হয়েছিলেন, উপমহাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু মূলধারার অর্থনীতির পাঠ থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে।

তবে হিরাকুদ বাঁধসহ অন্য সকল বাঁধেরই অর্থনৈতিক আর সামাজিক বিপর্যয় ছিল। ছিল মানুষ উচ্ছেদের হাহাকার। হিরাকুদ বাঁধের কারণে মহানদীর পারের দেড় লাখ মানুষ উচ্ছেদ হয়েছিল। আবার বাঁধগুলোতে একের পর এক সেচ ক্যানেল নির্মিত হলেও চারপাশের গ্রামগুলোতে সেচের পানি ‘চ্যানেল’ করার ন্যূনতম ব্যবস্থাও রাখা হয়নি। সব মিলিয়ে অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছিল বাঁধগুলো। নেহরুর প্রথম দশকে বড় বাঁধের সঙ্গে সংযুক্ত প্রকৌশলীরা প্রথমবারের মত কঠিন সমোলোচনার মুখে পড়েন। ১৯৬১-তে কুসুম নাইয়ের তাঁর 'Blossoms in the Dust: The Human Element of Indian Development' বইতে ভারতের মেগা বাঁধ নির্মাণের তুলকালাম উদ্যোগের সমালোচনা করে লিখেছিলেন, "On one side, we carry out irrigation and put more and more water for fresh areas, while on the other side land goes out of cultivation due to water logging...it is bad engineering if you cannot hold what you have already got in the process of acquiring more..."

ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ ২০০৩ সালে ‘দ্য হিন্দু’তে লিখেছিলেন, বড় বাঁধগুলোর কারণে ভারতের অগণিত মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হওয়ার বিষয়টি পঞ্চাশের শেষভাগে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গুহের ভাষায়, "Too many people had made too large a sacrifice for what was, in the end, not too great a benefit." একসময় এই মেগা অবকাঠামোগুলোর কারণে সৃষ্টি হওয়া মানুষের সীমাহীন দুর্দশা নেহরুর নজরে আসে। মাত্র এক দশকের ব্যবধানেই বড় বাঁধের স্বপ্নদ্রষ্টা নেহরু বৃহৎ এবং ‘কমপ্লেক্স’ অবকাঠামোর মোহ থেকে বেরোতে পেরেছিলেন। দ্রুতই এই প্রকল্পগুলোর প্রচারণা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন নেহরু। এমনকি বাঁধের মত বড় প্রকল্পগুলোকে ‘ডিজিজ অব জাইগান্টিসিজম’ (‘মেগা’ চিন্তার অসুখ?) বলেও তিনি অভিহিত করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে ভারতের ‘সেন্ট্রাল ইরিগেশন বোর্ড অব ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড পাওয়ার’-এর বার্ষিক সভায় নেহরুর একটি ভাষণে মেগা উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর বিপক্ষে তাঁর স্পষ্ট অবস্থান বোঝা যায় : "I have been beginning to think that we are suffering from what we may call the disease of gigantism...we want to show that we can build big dams and do big things. This is a dangerous outlook developing in India..."

পরবর্তীতে বড় প্রকল্পগুলোর একের পর এক সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয় প্রকট হয়ে উঠলে নেহরুর উন্নয়ন চিন্তায় কিছুটা হলেও গান্ধীয়ান অর্থনীতির মৌলিক চিন্তাগুলোর প্রভাব নজরে আসে। গ্রামের পর গ্রাম কৃষক উচ্ছেদ করে নয়, বরং গ্রামীণ সমাজব্যবস্থাকে মূল কেন্দ্রে রেখে স্থানীয় এলাকা ভিত্তিক অসংখ্য ছোট, বড়, মাঝারি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের মধ্য দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে কথা বলা শুরু করেন নেহরু। ১৯৫৮ সালে ইরিগেশন বোর্ডের প্রকৌশলীদের উদ্দেশে নেহরু আরও বলেছিলেন,

"...we can meet our problems much more efficiently by taking up a large number of small schemes.... The small irrigation projects, the small industries and the small plants for electric power will change the face of the country, far more than a dozen big projects.... I merely wish...to replace the balance in our thinking which has shifted too much towards gigantic schemes." সত্তরের দশকের শুরুতে পশ্চিমা বিশ্বে 'স্মল ইজ বিউটিফুল' এবং 'লিমিটস টু গ্রোথ' নামের যে দুটি ঐতিহাসিক মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হয়, সেখানেও 'সেন্ট্রালাইজড' এবং 'মেগা' উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোর সীমাবদ্ধতা এবং ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক শিল্পায়নের বিপর্যয়গুলো চিহ্নিত করে, স্থানীয় এবং 'ডিসেন্ট্রালাইজড' অর্থনীতির বিকাশকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, নেহরু বাঁধকে 'ভারতের মন্দির' বলেছিলেন, সেই ইতিহাস বহুল প্রচলিত, কিন্তু নেহরু যে 'ভারতের বাঁধ-ভারতের মন্দির' এই অর্থনৈতিক দর্শন থেকে সরে এসেছিলেন, এবং ক্ষুদ্র ও গ্রামভিত্তিক অর্থনৈতিক চিন্তায় মনোযোগী হয়েছিলেন, উপমহাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু মূলধারার অর্থনীতির পাঠ থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে।

পরবর্তীতে ভারতে বড় বাঁধ বিষয়ক প্রতিটি উদ্বেগই সত্যে পরিণত হয়েছে। যেমন আশির দশকে নর্মদা বাঁধ নির্মাণের সূচনাকালে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ছিল, নর্মদা বাঁধ তৈরি হলে ভারতের আড়াই লাখ হেক্টর জমি সেচের পানি পাবে। অথচ বাস্তবে শতকরা ৫ ভাগ জমিতেও পানি আনা যায়নি। বরং সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা ছোটবড় হাজারখানেক বাঁধের তলায় তলিয়ে গেছে ভারতের প্রায় ৪ কোটি মানুষের বসতভিটা। অরুন্ধতী রায় তাঁর 'Greater Common Good' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "Over the last fifty years India has spent Rs. 80,000 crores on the irrigation sector alone. Yet there are more drought-prone areas and more flood-prone areas today than there were in 1947"। ভারতের পরবর্তী সরকারগুলো বড় বাঁধ আর মেগা অবকাঠামোর মোহ থেকে প্রায় কখনই আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। শুধু বাঁধ নয়, একের পর এক কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কয়লা মাইনিং, ইউরেনিয়াম মাইনিং, আর প্রায় ছয় শ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভারে তলিয়ে গেছে ভারতের অগণিত কৃষিজীবী মানুষ।

আশির দশকে নর্মদা বাঁধ নির্মাণের সূচনাকালে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ছিল, নর্মদা বাঁধ তৈরি হলে ভারতের আড়াই লাখ হেক্টর জমি সেচের পানি পাবে। অথচ বাস্তবে শতকরা ৫ ভাগ জমিতেও পানি আনা যায়নি। বরং সারা ভারতে ছড়িয়ে থাকা ছোটবড় হাজারখানেক বাঁধের তলায় তলিয়ে গেছে ভারতের প্রায় ৪ কোটি মানুষের বসতভিটা।

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী মাইকেল লেভিন দীর্ঘদিন গবেষণা করে ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর কারণে সৃষ্টি হওয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্রটি তুলে ধরেছিলেন। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে একটি গোটা অঞ্চলের প্রায় সমস্ত কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে বিদেশি বিনিয়োগের সেন্টার বা কেন্দ্র তৈরি হতে পারে–এমন 'উন্নয়ন' ভাবনা থেকেই অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর যাত্রা শুরু হয় ভারতে। 'পাবলিক ইন্টারেস্ট' বা জাতীয় স্বার্থের 'লিগ্যাল' মোড়কে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জমি দিতে হাজার হাজার হেক্টর কৃষিজমি জোরপূর্বক অধিগ্রহণ করা শুরু হলে ভারতের সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, ওড়িশা, গড়াই ও রাইগড় অঞ্চলে তুমুল সব আন্দোলন শুরু হয়। ওই সময় রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ছিল, অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে মোট ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অথচ সরকারি হিসাবেই দীর্ঘ দুই দশকে অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাধ্যমে মাত্র ২০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। আর মাঝখান থেকে জমি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে গেছে কতশত লক্ষ মানুষ! অন্যদিকে অধিগ্রহণ করা কৃষিজমির প্রায় ৪০ শতাংশই এখন পর্যন্ত অব্যবহৃত পড়ে আছে।

গত দুই দশকে মেগা বাঁধ, মেগা বিদ্যুৎ, মেগা হাইওয়ে আর মেগা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উসিলায় ভারতে দারিদ্র্য কমেনি, বেকারত্ব কমেনি, দুর্নীতি কমেনি, মানুষের দুর্ভোগ কমেনি; বরং স্থানীয় কর্মসংস্থানগুলো হারিয়ে গেছে, কৃষক বসতভিটাসহ উচ্ছেদ হয়েছে, তলিয়ে গেছে লাখ লাখ হেক্টর কৃষিজমি। কয়লা খনি, কয়লা বিদ্যুৎ আর ইউরেনিয়াম খনির কেমিক্যাল দূষণে বিষাক্ত হয়েছে কতশত অঞ্চলের বাতাস, ক্ষয়ে গেছে কত লাখ মানুষের ফুসফুস, যকৃৎ, কিডনি, তার হিসাব কেউ রাখেনি।

গত এক দশকে ভারতের প্রতিটি ব্যর্থ মডেল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। ভারতের গণমানুষের জীবন-জীবিকা ও বসতভিটাকে দুমড়েমুচড়ে দেয়া প্রতিটি অন্তঃসারশূন্য উন্নয়ন মডেলকে এই রাষ্ট্র শুধু আমদানিই করেনি, এর সঙ্গে মিলেমিশে সীমাহীন দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, কমিশন বাণিজ্য আর লুটপাটতন্ত্রের এক নজিরবিহীন রেকর্ড স্থাপন করেছে। গত এক দশকে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ শাসনামলেই প্রায় ৩০টি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের চুক্তি সই হয়েছে, ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য প্রায় এক লাখ একর জমি অধিগ্রহণ হয়েছে, বাজেটের পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থায়নে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে। কয়লা বিদ্যুৎ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ, গভীর সমুদ্রবন্দর, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেস হাইওয়ে, ফ্লাইওভার, মেট্রোরেল, বিআরটিসির লাইন ইত্যাদি মেগা প্রকল্পের নামে বাছবিচার ছাড়াই ক্রমাগত ঢালাওভাবে ঋণ নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। প্রায় ৭০ শতাংশ বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরশীল এই মেগা প্রকল্পগুলোর ঋণ ও সুদের ভার কয়েক প্রজন্ম ধরে বহন করতে হবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকেই। শুধু তা-ই নয়, প্রতিটি মেগা অবকাঠামো নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লাগামহীন লুটতরাজের এক ভয়াবহ চিত্র। ভারত, চায়না, এমনকি ইউরোপের চেয়েও দুই থেকে তিনগুণ বেশি খরচে তৈরি হচ্ছে এদেশের হাইওয়ে এবং ফ্লাইওভারগুলো। সর্বস্তরে চুরির মানসিকতার ফলে এত অর্থ ব্যয় করার পরও রাস্তা-ব্রিজ-কালভার্ট কোন কিছুই টিকছে না, মেরামত ব্যয় বেড়েছে বহুগুণ। একদিকে অবিশ্বাস্য খরচে তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎকেন্দ্র আর টার্মিনাল, অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বছরে প্রায় অর্ধ কোটি টন কয়লা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহন করতে বিপুল রাষ্ট্রীয় খরচে তৈরি হচ্ছে সড়ক ও রেল রুট। বাস্তবতা হচ্ছে, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা এই অবকাঠামোগুলো ছাড়া একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রও লাভজনক উপায়ে চালু রাখা সম্ভব নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, উন্নয়নের নামে এই দেশকে নিম্নমানের ইম্পোর্টেড কয়লার আস্তানা বানাতে, দেশজুড়ে বিষাক্ত কয়লা পরিবহন করতে, লোড-আনলোড করতে জনগণের করের টাকার অঢেল অপচয় করেই তৈরি হচ্ছে একের পর এক ঋণনির্ভর মেগা অবকাঠামো। প্রশ্ন করুন তো, সারা পৃথিবী যখন অপেক্ষাকৃত

কম খরচবহুল এবং পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে 'স্মার্ট' বিনিয়োগ করছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ঠিক তখনই একেবারে উল্টো দিকে হাঁটছে কেন? নাহ্, এখানে কোন 'বৃহৎ উন্নয়ন দর্শনে'র চিন্তাভাবনা নেই। চিন্তা একটাই, পরিবেশবান্ধব বিদ্যুতে শতকোটি টাকার কমিশন বাণিজ্যের সুযোগ নেই।

আমরা তাই প্রশ্ন করতেই পারি, বর্তমান আওয়ামী রেজিমের বহুল প্রচারিত 'উন্নয়ন' ডিসকোর্সের আওতায় গৃহীত এইসব মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের উসিলায় আসলেই ঠিক কতসংখ্যক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে বা হবে? কী ধরনের শিল্পায়ন হয়েছে বা হবে? এত এত মেগা প্রকল্পের ছড়াছড়ি, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই মন্ত্রিসভায় হাজার কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের অনুমোদন, অথচ দশ বছরে দেশের বেকারত্ব ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ছাড়াল কেন? মেগা প্রকল্পগুলোর কারণে যে পরিমাণ কৃষিজমি বিনষ্ট হয়েছে, যত কৃষক উচ্ছেদ হয়েছে, যত পরিবার জীবিকা হারিয়েছে, তার বিপরীতে তৈরি হওয়া বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানগুলোর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য, ডেটাবেইজ, বা পরিকল্পনা কি আমাদের চোখে পড়ে?

বরং আমরা দেখছি উল্টো চিত্র। দেখছি মেগা প্রকল্পগুলোর কারণে উচ্ছেদ হওয়া মানুষের আহাজারি, ক্ষতিপূরণের নামে প্রতারণা, আর জীবিকা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়া জনপদ, দেখছি পায়রা ও মাতারবাড়ী কয়লা প্রকল্প দুটোতে শুরুর দিকে স্থানীয়দের কাজ দেয়া হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের ঢালাও ছাঁটাই। দেখছি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, এলাকার প্রতিটি কৃষিজীবী মানুষের উপার্জনের পথ বন্ধ করে দিয়ে, জেলেদের নৌকা চলার নদীগুলো ব্লক করে দিয়ে, ইলিশের প্রজননক্ষেত্রগুলো নষ্ট করে দিয়ে, পায়রা টার্মিনাল ও পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে কাজ করানো হচ্ছে চায়নিজ শ্রমিকদের (যাদের অধিকাংশই চায়নার জেলবন্দি)। দেখছি একাধিক মেগা প্রকল্পের দাপটে কেমন করে একটি উপকূলীয় জনপদের শত বছরের প্রাকৃতিক মানচিত্র বদলে গেছে, বহু বছরের পরিচিত কাজগুলো হারিয়ে গেছে, মেগা উন্নয়নের ধাক্কায় নিজ দেশেই রিফিউজি হতে চলেছে পায়রার মানুষ, মাতারবাড়ীর মানুষ, রামপালের মানুষ, সুন্দরবনের মানুষ, বাঁশখালীর মানুষ।

> রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি ছিল, অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে মোট ৪০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অথচ সরকারি হিসাবেই দীর্ঘ দুই দশকে অর্থনৈতিক অঞ্চলের মাধ্যমে মাত্র ২০ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। আর মাঝখান থেকে জমি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে গেছে কতশত লক্ষ মানুষ! অন্যদিকে অধিগ্রহণ করা কৃষিজমির প্রায় ৪০ শতাংশই এখন পর্যন্ত অব্যবহৃত পড়ে আছে।

অথচ শিল্পায়নের নামে অবিশ্বাস্য মাত্রায় কৃষিজমি দখল করে শিল্পায়ন কি আদৌ হয়েছে বাংলাদেশে? শিল্পায়নে রাষ্ট্রের আন্তরিকতা থাকলে সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রীয় মিলগুলোর এই ভগ্নদশা কেন? খুলনার পাটকলগুলোর এই অবস্থা কেন? বিসিকের জন্য অধিগ্রহণ করা বিপুল পরিমাণ জমি খালি পড়ে থাকে কেন? নতুন করে অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে হয় কেন? বিসিকের প্লট পেতে বিনিয়োগকারীদের মোটা অঙ্কের ঘুষ দিতে হয় কেন?

বাস্তবতা হচ্ছে, গত এক দশক ধরে মেগা প্রকল্প আর বড় জিডিপির মিশেলে 'উন্নয়নে'র যে ডিসকোর্স হাজির করেছে বর্তমান রেজিম, তার সঙ্গে না আছে শিল্পায়নের কোন সম্পর্ক, না আছে গণ-আকাঙ্ক্ষার কোন প্রতিফলন, না আছে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ন্যূনতম কোন প্রচেষ্টা, না আছে জবাবদিহির কোন কাঠামো, না আছে আইনের শাসন বা 'জাস্টিস' প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র কোন নিদর্শন। বরং ঠিক এই মুহূর্তে এই ধরনের অন্তঃসারশূন্য উন্নয়ন মডেলের বিপক্ষেই সারা ইউরোপে তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। 'এটার্নাল গ্রোথ' বা জিডিপিসর্বস্ব উন্নয়ন চিন্তার বিরুদ্ধে গ্রেটা থুনবার্গের 'হাউ ডেয়ার ইউ' নতুন করে ধাক্কা মেরেছে উন্নয়নের এইসব বাটপারি চিন্তাভাবনাকেই।

পঞ্চাশের দশকে ভারত যখন মেগা প্রকল্প আর ভারী শিল্পায়নের দিকে ঝুঁকেছিল, সেখানে নেহরুর কয়েক দশকের ধারাবাহিক উন্নয়ন ভাবনার প্রতিফলন ছিল। দু শ বছরের ব্রিটিশ শাসনে ভারতের নিজস্ব শিল্পগুলো ধ্বংস হয়েছিল, ব্রিটিশ টেক্সটাইলের অবাধ প্রবেশে ভারতের নিজস্ব টেক্সটাইল সংকোচনের মুখে পড়েছিল, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর পর একটি স্বনির্ভর এবং বৃহৎ শিল্প কেন্দ্রিক অর্থনীতির আকাঙ্ক্ষাই তখন স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া গোটা ত্রিশ আর চলিশের দশক জুড়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন বকে পেট্রোলিয়াম, স্টিল, টেলিযোগাযোগ, মাইনিং আর মোটর কারখানার মত ভারী শিল্পগুলোর ব্যাপক বিকাশ হয়েছিল। বলা যায়, পঞ্চাশের দশকে নেহরুর ভারী শিল্পের 'ভিশন' ওই সময়ের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অমূলক ছিল না। পরবর্তীতে বৃহৎ প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠায় নেহরু মেগা শিল্পায়নের উন্নয়ন দর্শন থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিন্তা করতেও সংকোচ করেননি। নেহরুর ভাষায়, "The idea of big...having big undertakings and doing big things for the sake of showing that we can do big things...is not a good outlook at all!" বলা যায়, 'নেহেরুভিয়ান সোশ্যালিজমে'র অনেক মার্ক্সীয় সমালোচনা থাকলেও নেহরু অন্ততপক্ষে তাঁর 'উন্নয়ন' ভাবনায় আন্তরিক ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের হালের উন্নয়ন চিন্তায় কোন গণ-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন কি দেখা যায়? কোন আন্তরিক উন্নয়ন ভাবনার দেখা মেলে? কোন দিন বাংলাদেশের সঠিক উন্নয়ন ইতিহাসটি লেখা হলে, আমরা কি জানতে পারব, জনগণের করের টাকার কি বিপুল অপচয় করেছিল এই রাষ্ট্র? কি বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছিল শুধুমাত্র উন্নয়নের নামে? আমরা কি জানতে পারব, মেগা প্রকল্পগুলোর ধাক্কায় উচ্ছেদ হয়ে একদিন এই দেশেরই কত হাজার লক্ষ কৃষিজীবী মানুষ স্রেফ পোকামাকড়ের মত ভেসে গিয়েছিল? সত্য এটাই যে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের যে চিত্রটি আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাই, তা ধ্বংসের, লুটের, অব্যবস্থাপনার। গণমানুষের মূলধারার জীবন-জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক অদ্ভুত লুটপাটযজ্ঞের।

পরিশিষ্ট

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি যৌক্তিক প্রশ্ন উঠতে পারে–বৃহৎ প্রকল্প বা মেগা অবকাঠামো মাত্রই জনগণের জন্য অকল্যাণকর কি না? আদমজী পাটকলের মত একটি বৃহৎ শিল্পকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব? অথবা, শুধুমাত্র আকার-আকৃতির ওপর উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ভাল-মন্দ নির্ভর করে কি না? সম্পূরক প্রশ্ন উঠতে পারে, ক্ষুদ্র প্রকল্প মাত্রই জনগণের জন্য কল্যাণকর কি না? এই বিষয়ে পরবর্তী সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করার আগ্রহ রাখছি।

মাহা মির্জা : গবেষক
ইমেইল : maha.z.mirza@gmail.com

তথ্যসূত্র

Leving, Michael. Special Economic Zones and Accumulation by Dispossession in India. Journal of Agrarian change. 20 September 2011

Observer Research Foundation. SEZs will create 4 million jobs. 23 July 2007
https://www.orfonline.org/research/sezs-will-create-4-million-jobs/

Roy, Arundhati. *The Greater Common Good.* 1999

Guha, Ramchandra. The Prime Ministers and Big Dams. *The Hindu.* 18 December 2005

Watson, Rajula Annie. *Development and Justice: A Christian understanding of Land Ethics.* pp. 294

D'Monte, Darryl. Temples or Tombs? Industry or Environment? Three Controversies. 1985

Purohit, Makarant. Damn the Dams, say the Displaced. August 30, 2016
https://www.indiawaterportal.org/articles/damn-dams-say-displaced

Thripathi, Purnima. Sacrificial Lambs. Frontline Cover story. Vol 28, Issue 12, June 2011

মহাসড়ক মেরামতে ব্যয়-উলাস, কালের কণ্ঠ, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯
https://www.kalerkantho.com/print-edition/first-page/2019/09/12/813704?fbclid=IwAR1DRTx1rNk1YwvzUDUnkV1HtFEAN0fbjoT-0-Rx3hwTTtYfWvND7_8hfms

Consequences on next generation from aging mega projects and external debts. Center for policy dialogue. 18 July 2018
https://cpd.org.bd/consequences-on-next-generation-from-aging-mega-projects-and-external-debts-dr-debapriya/

Business Line. 62% of SEZs are operational and have created 20 lack jobs. 25 December 2018
https://www.thehindubusinessline.com/economy/62-of-sezs-are-operational-and-have-created-20-lakh-jobs/article25827760.ece

* লেখাটি অনলাইন পত্রিকা netronews, নভেম্বর ২০১৯ সংখ্যাতেও প্রকাশিত

তথ্যসূত্র: ০৬ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো